

# পুঁই মাচা

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখালেনই না, এমনকি বিশেষ কোন কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, বসে রইলে যে ? দাও না একটা ঘটি ? আঃ, খেস্তি-টেস্তি সব কোথায় গেল এরা ? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না ?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পারো ?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে বাড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া বাড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন—কেন ? কি আবার....কি

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তসুরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জানো না, নাকি খোঁজ রাখো না ? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পারো ? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জানো?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ? কি গুজব ?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্‌দী দুলে-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্রলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বীর বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ল না,—ও নাকি উচ্ছুগু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগ্‌দী-বাড়ী উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে ! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর ! ও !....

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি ? তুমি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক ? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি ?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।....হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?...পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে ?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটা কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কি-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কি-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ খামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে ? ক্ষেস্তি-মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে....

চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারো পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল ; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুঁইপাতা জড়ানো কোন দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাচের চুড়িগুলো দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেস্তি, কারণ, সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকী আছে। আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো....ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে—নিয়ে যা....কেমন মোটা মোটা....

অল্পপূর্ণা দাওয়া হইতে অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমতই তোমাকে তারা দিয়েছে ! পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত....নিয়ে যা....আর উনি তখন আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটাতে হ'ল না....যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে....খাড়া মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না ? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে ! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে! খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না ?....কোথায় শাক, কোথায় বেগুন-আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ-ফেল্ বলছি ওসব....ফেল্ !....

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অল্পপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়িকির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো....

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়িকী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।....সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে....তুমি আবার....বরং....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অল্পপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের ? একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে ! যা, যা তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়....

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না।—নিঃশব্দে খিড়িকি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অল্পপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেপ্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের।

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়িকি-দোরের আশে-পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাইগাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেপ্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'একবার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অল্পপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেপ্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেপ্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অল্পপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লক্ষা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে সব দিন কি আর আছে ভায়া ? এই ধরো কেপ্ট মুখুয়ে....স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না করে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে, মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে। তার কি স্বভাব ? রাম বলো, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়। পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে ? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশীদূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়....

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শূনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের ? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শূনি ? ও তো একরকম উচ্ছৃগু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকী, এই তো ?....সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল ।...পাত্তর পাত্তর ! রাজপুত্র না হলে কি পাত্তর মেলে না ? গরীব মানুষ, দিতে খুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম।

লেখাপড়া নাই বা জানলে ? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না ?—দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর—শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যাস—রাজার হাল ! দুই ভাইয়ের অভাব কি ?....

ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা-ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবাস্তব তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয়্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবুর গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন—বড় মেয়ে ক্ষেপ্তি আসিয়া চুপিচুপি বলিল—বাবা, যাবে না ? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, যা শীগগির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি। কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকর্ষার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়িকির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটি লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেপ্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সম্ভর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—ইহারা, কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন, মুখুয্যেবাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল, খুড়ীমা, মা বলে দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বন্ মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে ?

মুখুয্যে-বাড়ী ও-পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হন্দে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা !—পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল....কে যেন কি খুঁড়িতেছে....দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেপ্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেপ্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এফুনি যাব আর আসব।

ক্ষেপ্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে—কর্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং....

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুন?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি ! না আমি কখন ? কক্ষনো না, এই তো আমি....সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বলো না।....আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি....দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ....তখন আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি

শব্দ....তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে ।

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিতি থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন ; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও যোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।....

আধঘণ্টা পরে ক্ষেপ্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেপ্তি এদিকে একবার আয় তো, শূনে যা....

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেপ্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেপ্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্তদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল ; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড় ? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না ?

ক্ষেপ্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়ছিল, উত্তর দিল— হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আন্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছো মেটে আলু চুরি করতে ? সোমন্ত মেয়ে, বিয়ের যুগি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে ! যদি গোঁসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয় ? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত ? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত ? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা ?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে ধূলামাটি মাথা হাতে ক্ষেপ্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এসো....

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেপ্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যন্তাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্ধ্বমুখে একখণ্ড শূক্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো ! বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে।

ক্ষেপ্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে ? আজকাল রাতে, খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা বুড়ি করিয়া ক্ষেপ্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয়ে-বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল । সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেপ্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয় ? দেখ দিকি, এই শীত।

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো....

—হ্যাঁ দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে, বুঝলি নে ?-সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই ? ক্ষেপ্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে ?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেপ্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা

ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন, একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুড়ুনির নীচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া একমালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে বাদারে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল, মা, ঐ একটু....

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু....

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুক্কনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারিকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।....ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ওবেলা তো পায়ের, ঝোল-পুলি, মুগতজ্জি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদি বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারিকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বাঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা! খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা। ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হ'ল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর মা'র পিঠেতে কখনো কোন গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাঁই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারিকেল-কোরা একটু নেবো?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারিকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি! গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ওবেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই থাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব!

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি....ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দলিনো ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু....সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অল্পপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সম্মেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেত্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি....

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেত্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোনমতেই হইবে না। তবু প্রথমে এখানে অল্পপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইঁটের ব্যবসায় দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা !

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অল্পপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেত্তির মনে কষ্ট হয়, এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেত্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অল্পপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেত্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।....তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেত্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে ?....

যাইবার সময় ক্ষেত্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সাত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো....বাবাকে পাঠিয়ে দিও....দু'টো মাস তো....

ওপাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোরা বাড়ী যাবে কেনরে, আগে নাতি হোক, তবে তো....

ক্ষেত্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি?....দেখো তো, কেমন না যান !

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অল্পপূর্ণার মন হু-হু করিত....তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বলব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি.....

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে রাখো, ও-রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল আর কি জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—নাঃ, সব তো আর....তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি ?

সহায়হরি হুঁকাতায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে ? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা। বাকী ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার।

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম করেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না। মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে....ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খাই-খাই....আরও কত কি ! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম—মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে ?

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোন কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর ?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে ! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শূনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে....পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয়োর নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি....প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শূঙ্ক সুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শূঙ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হ'ল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে....

—দেখতে পাওনি ?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।...যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে ?....পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।....

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন ?

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে....

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে ব'সো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না ? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল....খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন....দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল—মা দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ঝাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল বাড়ীর পিছনে ঝাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার খোলো খোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে !...

পুঁটি ও রাধী খিড়কি-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তরুতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কি-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি ?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর-বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম....

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠা গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশী।....জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে....দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিড়িতে চিড়িতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত....

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল—যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে....বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে....সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।